বাংলা বিভাগ

দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

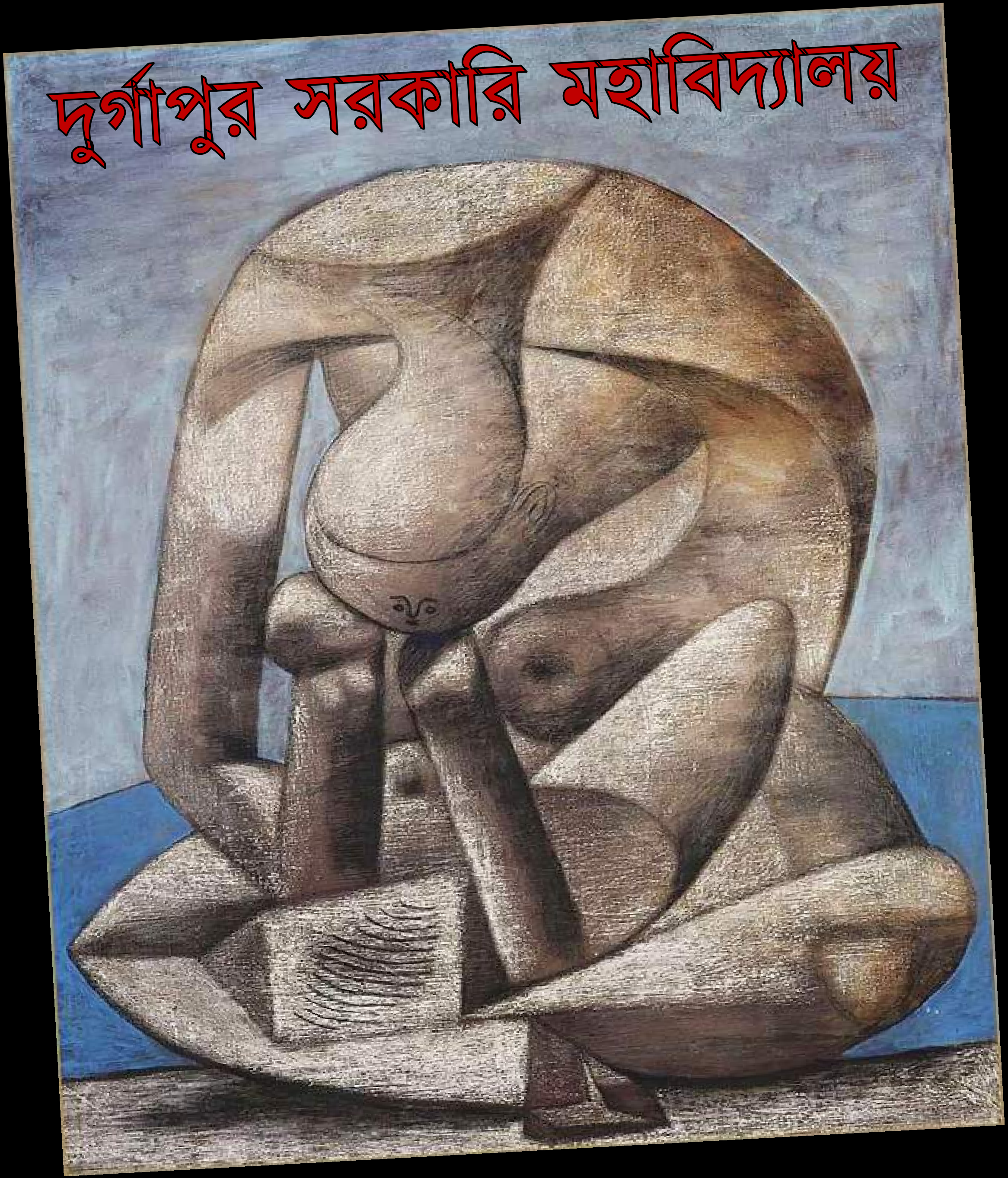

বিভাগীয় সমাচার দর্পণ ১

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ চিত্র: পাবলো পিকাসো, দ্য রিডার, ১৯৩৭

দুর্গাপুর ব্যারেজে সন্ধ্যা-আরতি।
ছবি: তৃষা সৌ। বাংলা বিভাগ।
তৃতীয় সেমেস্টার।

‘বিভাগীয় সমাচার দর্পণ ১’ প্রকাশিত হল। দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সংক্রান্ত তথ্যাবলী এখানে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই প্রকাশ উপলক্ষ্যে প্রথমেই অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা আমরা বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি। আশা করি, সকলের সদর্থক পরামর্শ বাংলা বিভাগের অগ্রগতির সহায়ক হবে।

বাংলা বিভাগ

যোগাযোগ:
জয়ন্তী সাহা, বিভাগীয় প্রধান (৯৪৩৪৫৩৯৪৮০)
মানস কুণ্ডু (৯৮৩৬৪৯১৪৩২)
ধনঞ্জয় দাস (৯০৯৩০৮৯১৪০)
ঈশানী রায় (৯৪৭৭৫৯১১৪৫)
সুস্মিতা রায় (৭৪৩৯০৬৬৪১৮)

এই সংখ্যায়:

ক.

বাংলা বিভাগ আয়োজিত দুটি আলোচনা-সভা। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন অধ্যাপক দীপঙ্কর রায়, ইংরেজি বিভাগ, বিশ্বভারতী ও অধ্যাপক অভীক মজুমদার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। দুটি বক্তৃতাই ছিল একটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র রেখে, যা হল বিভিন্ন বিদ্যা-বিষয়ের সঙ্গে বাংলা বিদ্যাচর্চার সংযোগ-সম্বন্ধ। প্রথম বক্তৃতায় অধ্যাপক রায় বিষয়টির তাত্ত্বিক দিকটি আলোচনা করেন, আর দ্বিতীয় বক্তৃতায় অধ্যাপক মজুমদার আন্তঃসম্পর্কিত বিদ্যা-চর্চার ক্ষেত্রে অনুবাদ-চর্চার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি ব্যক্ত করেন। এই সংখ্যার জন্য অধ্যাপক দীপঙ্কর রায় তাঁর বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আমাদের লিখে পাঠিয়েছেন। ছাত্রছাত্রী ও উৎসাহী পাঠকের জন্য লেখাটি প্রকাশিত হল। দুটি বক্তৃতাই শোনা যাবে: “বাংলা বিভাগ Durgapur Government College”-এর ফেসবুক পেজে।

দেখুন: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057539496156

খ.

Interdisciplinarity যে কেবল ক্লাসঘরের চার-দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ নয়, তা যে পথে পথে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভিতরেও খুঁজে নিতে হবে, এই চিন্তা থেকেই বাংলা বিভাগ "মন্দির দেখা ও মন্দির পড়ার" পরিকল্পনা করেছে। রাঢ় বাংলার প্রাচীন মন্দিরগুলির স্থাপত্য ও মন্দির-গাত্রে ভাস্কর্য-চিত্রগুলিতেই লুকিয়ে আছে আমাদের দেশীয় ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সন্ধানে ছাত্রছাত্রীরা মন্দির দেখেছে জয়দেব ও ইলামবাজার-সংলগ্ন এলাকায়। আর মন্দির বিষয়ে আমাদের পড়িয়েছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু। এই বিষয়ে তাঁর একটি লেখা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে অধ্যাপিকা বসু আমাদের বাধিত করেছেন।

গ.

ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসঘরে ও বাইরে যা শিখেছে তার সোৎসাহ প্রকাশ ছিল তাঁদের নিজস্ব আলোচনা-সভায়, দেওয়াল-পত্রিকার রূপায়ণে, এবং অবশ্যই ইন্টারনাল পরীক্ষায় উত্তর-প্রদানের নবতর কৌশলে। এই সংখ্যায় তাঁদের উৎসাহ ও উদ্যোগের কিছু ছবি প্রকাশিত হল। বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ স্পোর্টসেও সফল। তাঁদের সাফল্যের কিছু মুহূর্ত এখানে দেখা যাবে। এই সংখ্যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ পঞ্চম সেমেস্টারের ছাত্র দুর্লভ ঠাকুরের তোলা একটি ছবি।

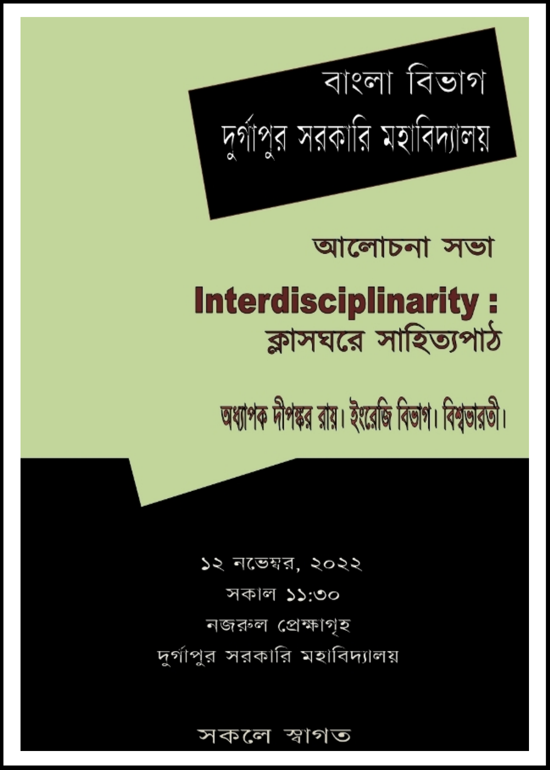

বাংলা বিভাগ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

আলোচনা সভা

Interdisciplinarity :
ক্লাসঘরে সাহিত্যপাঠ

অধ্যাপক দীপঙ্কর রায়। ইংরেজি বিভাগ। বিশ্বভারতী।

১২ নভেম্বর, ২০২২
সকাল ১১:৩০
নজরুল প্রেক্ষাগৃহ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সকলে স্বাগত

"Interdisciplinarity: ক্লাসঘরে সাহিত্যপাঠ"
অধ্যাপক দীপঙ্কর রায়, ইংরেজি বিভাগ, বিশ্বভারতী
১২ নভেম্বর, ২০২২

বাংলা বিভাগ আয়োজিত আলোচনাচক্র

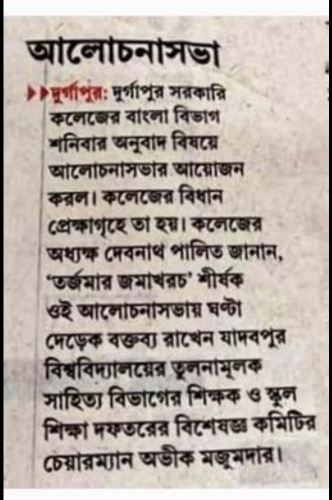

আলোচনাসভা

▸▸দুর্গাপুর: দুর্গাপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগ শনিবার অনুবাদ বিষয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করল। কলেজের বিধান প্রেক্ষাগৃহে তা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ দেবনাথ পালিত জানান, 'তর্জমার জমাখরচ' শীর্ষক ওই আলোচনাসভায় ঘণ্টা দেড়েক বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক ও স্কুল শিক্ষা দফতরের বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার।

আনন্দবাজার পত্রিকা।
২৭ নভেম্বর ২০২২।

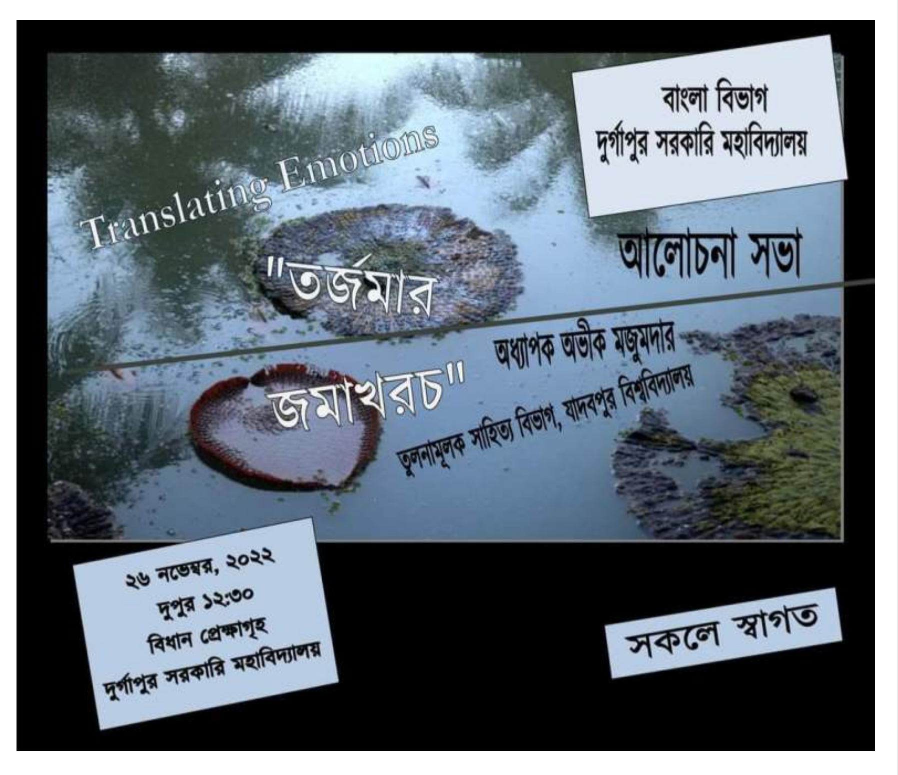

Translating Emotions

বাংলা বিভাগ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

আলোচনা সভা

"তর্জমার জমাখরচ"

অধ্যাপক অভীক মজুমদার
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২৬ নভেম্বর, ২০২২
দুপুর ১২:৩০
বিধান প্রেক্ষাগৃহ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সকলে স্বাগত

"তর্জমার জমাখরচ"
অধ্যাপক অভীক মজুমদার,
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২৬ নভেম্বর, ২০২২

“Interdisciplinarity: ক্লাসঘরে সাহিত্যপাঠ”

ড. দীপঙ্কর রায়
ইংরেজি বিভাগ, বিশ্বভারতী

আজকের আলোচনার শিরোনাম, “Interdisciplinarity: ক্লাসঘরে সাহিত্যপাঠ। ‘Interdisciplinarity’ শব্দটির কোনো পারিভাষিক বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই আর আমার এক সহকর্মী, বাংলার অধ্যাপক, আমাকে বলতেও পারেন নি; অগত্যা শিরোনামে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক একটা ব্যাপার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, যদিও শিরোনামে সুস্পষ্ট দুটি ভাগ বিদ্যমান তবে আজকে আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপে সাহিত্য পাঠের বিষয়টি।প্রথম ভাগটি ব্যবহার করা হবে মূল আলোচনার কেবলই এক তার্কিক প্রস্থানভূমি (point of departure) হিশেবে। তার দুটি কারণ, প্রথমতঃ সময়াভাব; দ্বিতীয়ত,বিষয়টি গুরুত্বে ও বিস্তারে এক সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। একদিকে ল্যাটিন “disciplina” থেকে জাত ‘discipline’ শব্দটির সঙ্গে যেমন সৈনিক, কয়েদী কিংবা স্কুলশিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার অনুসঙ্গটিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই তেমনই অপর দিকে শব্দটিকে বিদ্যাচর্চার কোনো এক বিশেষ শাখা বা জ্ঞানতত্ত্বের দ্যোতক হিশেবে হামেশাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভাবনার কথা, এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা কেন একই শব্দ দ্বারা নির্দেশিত হয়। দুটি অর্থের মধ্যে কি অন্তর্নিহিত কোনো সম্পর্ক বর্তমান? অপরপক্ষে,শব্দার্থিক দিক থেকে দেখলে,‘inter’ উপপদটি যেমন দুটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যেসংযোগ স্থাপন করা বোঝায় (যেমন international); তেমনি, সেটি আবার পৃথকীকরণ’ ও বোঝাতে পারে(যেমন, ধরা যাক interval শব্দটি)। এতটুকু (‘inter’ এবং ‘discipline’ – এই অর্থগত বহুত্ব বৈশিষ্ট-সমন্বিতপদের জোড়) থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে interdisciplinarity’র জল কত গভীর ও তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হতে পারে। ওসবের মধ্যে না গিয়ে, ‘সাহিত্য’ নামক বস্তুটিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠের বিষয় (discipline) হিশেবে কী প্রকারে দেখা যেতে পারে তার একটা কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো ধারণাকে তুলে ধরাই আজ আমার উদ্দেশ্য। শুধু আলোচনা চলাকালীন উপস্থিত সকলকে আলোচনার চালচিত্র হিশেবে interdisciplinarity নামক বিষয়টির সমস্যায়িত চরিত্রটিকে স্মরণে রাখতে অনুরোধ করবো।

আলোচনার মূল বিষয়ে আসা যাক – ক্লাসঘরে সাহিত্যপাঠ। যে কোনো বিষয় অধ্যয়ন শুরু করতে গেলে প্রথমেই দরকার পড়ে বিষয়টির (object of study) একটি বাস্তবোচিত সংজ্ঞা নিরূপণ করা। ‘সাহিত্য’ নামক বস্তুটির সংজ্ঞা নিরূপণ করার কাজটি কিন্তু সহজ নয়। ক্লাসঘরে সাহিত্যের আলোচনার অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রাখলে সে চেষ্টা আরো দুরূহ বলে মনে হয়। স্যার-দিদিমণিরা প্রায়শই ক্লাসে সাহিত্যগ্রন্থের আলোচনা করতে দিয়ে মনস্তত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের নানা শাখায় বিচরণ করে থাকেন (interdisciplinarity?)। তাদের আলোচনার এক-চতুর্থাংশ অংশের অভিমুখ যদি বইয়ের পাতায় ছাপা শব্দ সমষ্টির দিকে থাকে তো বাকি তিন-চতুর্থাংশ ধাবিত হয় বিশ্বসংসারের তামাম বিষয়ের প্রতি। শিক্ষার্থীর মনে হতে পারে, শিক্ষকের উদ্দেশ্য যেন সাহিত্য পড়া নয় – সাহিত্য কী করে পড়তে হয় তা শেখানো আর তা করতে গিয়েই এহেন বাক্যজাল বিস্তার! কিন্ত, সাহিত্যের সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির সম্পর্ক ঠিক কী প্রকারের তা আমাদের কখনোই প্রাঞ্জল ভাবে বোঝানো হয় না। আবার,সাহিত্যের সংজ্ঞা হিশেবে অনেক সময় আমরা বলি যে “সাহিত্য হচ্ছে জীবনের এক প্রতিচ্ছবি” । এতে করেও বিষয়টা পরিষ্কার হয় না কারণ ‘জীবন’ শব্দটির অর্থ বহুবিধ ও ‘প্রতিচ্ছবি’ শব্দের প্রয়োগ এক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটিও ঠিক কীরকম তাও আমাদের কেউ বলেন না। এমতাবস্থায়, যেখানে পাঠ্য বিষয়ের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা মেলাই দুষ্কর, সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে কী করা?একটা স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যেতে পারে – যাকে বলা যেতে পারে “no knowledge-beforehand” স্ট্র্যাটেজি।অর্থাৎ কিনা একেবারে পরিস্কার স্লেট নিয়ে শুরু করা। এটা ধরে নিয়ে পাঠ শুরু করা যে সাহিত্য কাকে বলে এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান একেবারে শূন্য। কিন্তু, তা করতে পারা খুব কঠিন। কারণ ‘সাহিত্য’ নামক বিষয়টির সঙ্গে আমাদের প্রথমবার মুলাকাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্লাসরুমের বাইরেই হয়ে থাকে। তাই সাহিত্য বিষয়টি নিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় সাহিত্যে সম্পর্কে একরকমের ধারণা (‘always-already’ idea/ ‘prejudice’) আমরা সকলেই সঙ্গে নিয়ে আসি। সেটিকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে কাজ শুরু করা অসম্ভব! যেমন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিংবা উইলিয়াম শেক্সপিয়রের নাটক পড়ার সময় এই মহান সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কিছু ধারণা/ সিদ্ধান্ত (prejudice) আমাদের মনের মধ্যে আগে থেকেই বর্তমান থাকার ফলে সম্পূর্ণ নির্মোহ ভাবে তাঁদের সৃষ্টিকে পাঠ করা সম্ভব হয় না।

কোনো বিষয়কে প্রকৃত রূপে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হলো বিষয়টিকে পরিপূর্ণ রূপে বোঝা – এমনভাবে বোঝা যাতে করে বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করার মতো জায়গায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু অনুধাবন কিংবা বিশ্লেষণ করার মতো গভীর কাজ তো prejudice-এর উপর নির্ভর ক’ রে

করা উচিত নয়, তাই না? তাহলে, অবশ্য করে আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে, এমন এক প্রণালীবদ্ধ, যৌক্তিক ও সুশৃঙ্খল পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যার দ্বারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কাজটি যথোপযুক্ত ভাবে করা যায়। সিলেবাস-নির্ভর, ক্লাসরুমে সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সময় আমাদের তাই মনে রাখতে হবে যে কোর্স সফলভাবে শেষ করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য সাহিত্যিক হয়ে ওঠা কিংবা নিছকই এক মনোযোগী পাঠক হয়ে ওঠা নয়। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত কী কী উপায়ে সাহিত্যের নিবিড় পাঠ সম্ভব যা আমাদের সেই বিষয়ে সর্বতোমুখী জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করবে। কেবল সিলেবাসের অন্তর্গত কিছু কবিতা, নাটক, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পাঠ করাই ক্লাসরুমে সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য নয় – উদ্দেশ্য হচ্ছে কী কী পদ্ধতি দ্বারা কোনো একটি টেক্সট্ পড়া সম্ভব– সেই টেক্সটির সঙ্গে সমাজ-ইতিহাসের সম্পর্ক কী প্রকারের –সেই জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করা। আজকের আলোচনায় আমার যুক্তি হবে, তার জন্য প্রয়োজন ‘প্রশ্ন করার এক মানসিকতা’ কে সতত লালন করে চলা। প্রশ্ন করার মাধ্যমেই হয়তো আমরা সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ কিছু সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি।তাই আমার বক্তব্যের প্রধান উপজীব্য হলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য পাঠের পরিসরে উত্থাপন করা যেতে পারে এরকম কয়েকটি প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা।

এখন, একে একে, “সাহিত্য কী?”, “সাহিত্য কোথায়?”, “সাহিত্য কখন?” এবং “সাহিত্য কেন?” – ক্লাসে সাহিত্য পাঠের সময় এরকম কয়েকটি সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দু-একটি কথা বলা যাক।শুরু করা যাক “সাহিত্য কী?” এই প্রশ্নটি দিয়ে। ইংরেজি ‘literature’ শব্দটির মুল খুঁজতে গেলে আমাদের ল্যাটিন “littera” শব্দটির কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হয় যার অর্থ, “বর্ণমালা দ্বারা তৈরী যে কোনো রচনাই হলো সাহিত্য” । একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা জানি যে সাহিত্যের এহেন সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে আজও ওষুধের প্যাকেটের ভিতরে কিংবা কোনো যন্ত্রের বাক্সের ভিতর যে কাগজটি থাকে তাকে ‘literature’ নামেই অভিহিত করা হয়। উপরের সংজ্ঞা থেকে আরো একটি দরকারি ধারণা যা আমাদের নজর এড়ায় না তা হলো এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সকল প্রকার মৌখিক সাহিত্য (“Oral Literature”) সাহিত্যের আওতার বাইরে পড়ে যায়। অথচ, মনে রাখতে হবে,যে ইলিয়াড থেকে মহাভারত–বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সমস্ত প্রধান মহাকাব্যগুলিই কিন্তু Oral Literature-এর উদাহরণ। আবার ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের প্রেক্ষিতে “সাহিত্য” শব্দটির সঙ্গে “সহিতের ভাব/ধারণা” এই ধারণাটি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত – অর্থাৎ কিনা সাহিত্য এমন এক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া যেখানে অনেক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ হচ্ছে এক প্রাথমিক শর্ত। তার মানে জোর গিয়ে পড়ছে সাহিত্যের প্রদর্শন-আঙ্গিক

(performative dimension)-এর উপর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ‘literature’ এবং “সাহিত্য” শব্দদুটি আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গে চালিত করছে – সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞার দিকে নয়। আবার, অনেক সময় “সাহিত্য কী?” এই প্রশ্নের উত্তরে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করা হয়, “ভাষার শৈল্পিক ও সুচারু প্রয়োগের দ্বারা মনুষ্য জীবনের প্রকৃত অবস্থাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টাই হলো সাহিত্য” । এখানেও একাধারে একাধিক অনচ্ছ ও বহুমাত্রিক শব্দের প্রয়োগ। কাজ বিশেষ এগোয় না। আজকের দিনে “সাহিত্য কী?” সে প্রসঙ্গে, পশ্চিমের সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে যদি বলি, “ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ধরলে,রেনেসাঁস-পরবর্তী কালে, এক বিশেষ শৈলীর লিখন যা মানুষের মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিশ্লেষণের উদাহরণ হিশেবে মান্যতা পেয়েছে তাই সাহিত্য” তাহলে কেমন হয়? এরূপ সংজ্ঞা আমাদের এক বিশেষ যুগে ‘সাহিত্য’ নামক প্রতিষ্ঠানটির উত্থানের দিকে দিক নির্দেশ করে। ব্যাপারটা জটিলতর হয়।

একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করি। “সাহিত্য কী?” এই প্রশ্ন না করে যদি প্রশ্ন তুলি, “সাহিত্য কোথায় থাকে?”– তাহলে কেমন হয়? ও বাবা, তাহলে তো দেখি এই প্রশ্ন আরো অন্য প্রশ্নদের ডেকে আনে। যেমন, “কোথায় থাকে মানে কি–সমাজের কোথায় থাকে?” কিংবা, “সাহিত্য কি বইয়ের দু’ মলাটের ভিতর থাকে?” “তা কি সাহিত্যিকের মাথার ভেতরেথাকে না কি পাঠকের মনে? না কি অন্য কোথাও?” –চিন্তা আসে যে সাহিত্যের তাহলে আলাদা আলাদা ক’ রে ‘সামাজিক’ , ‘মনস্তাত্ত্বিক’ কিংবা ‘প্রায়োগিক’ অবস্থান সম্ভব।সামাজিক মাত্রার কথা ভাবলে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যেখেটে খাওয়া,“দিন আনি-দিন খাই” মানুষদের আঙিনাতেও কি ‘সাহিত্য’ বাস করে? আবার লেখক কিংবা পাঠকের মনের কথা বললে প্রশ্ন উঠতে পারে ‘মন’ মানে কী?– হৃদয়? আত্মা? মস্তিস্ক? চেতনা? বুদ্ধি? সত্ত্বা? না কি অন্য কিছু? এ প্রশ্নও উঠতে পারে, “আচ্ছা গোটা বিশ্ব জুড়েই কি সাহিত্যের বাস?” নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিউপজাতির মাঝে সাহিত্যের যে ধারণা আছে সেই ধারণাই কি সুন্দরবন অঞ্চলের বয়াতীদের মধ্যে বিদ্যমান? আবার, সেই ধারণার সঙ্গে প্রত্যেক বছর ‘বুকার’ প্রাইজ যারা দেন তাদের সাহিত্য সম্পর্কে ধারণার সাযুজ্য কতটা? সাহিত্যের কি সত্যিই কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা হতে পারে? আমরা যে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে হাল হামেশাই “বিশ্বসাহিত্য” নামক ধারণার কথা শুনি। আবার মনে পড়ে, একসময় পরাধীন ভারতে ‘জাতীয় সাহিত্য’ সম্পর্কিত প্রতর্কটি প্রবল গুরুত্ব ধারণ করেছিল। সাংস্কৃতিক বহুত্বের কথা ভাবলে কিন্তু এহেন ধারণাগুলির “constructedness” (বাংলা করতে পারলাম না) চরিত্রটি বেরিয়ে পড়ে।

যদি প্রশ্ন করি “সাহিত্য কখন?” তাহলে তো আলোচনা বহুধা বিভক্ত হতে বাধ্য! তার একটা দৃষ্টিকোণ ‘সাহিত্য’ নামক প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহাসিকতার দিকে ধাবিত হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে John Milton যখন Paradise Lost লিখছেন কিংবা যখন কবীর তাঁর দোঁহাগুলি মুখে মুখেরচনা করছেন তখন কি তাঁদের মনে এই ধারণা ছিল যে তাঁরা ‘সাহিত্য’ সৃষ্টি করছেন? আমরা আজ জানি যে মিলটনের ক্ষেত্রে, বাইবেলের কাহিনীর আড়ালে, কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা ও তাঁর নিজের রাজনৈতিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা –‘সাহিত্যগ্রন্থ’ সৃষ্টি করা নয়। আর কবীরের ক্ষেত্রে তা ছিল মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের উন্নতিসাধনের এক সুনির্দিষ্ট মার্গ চিহ্নিত করা। (এঁদের সময়ে ‘সাহিত্য’ বলতে আজকে আমরা যা বুঝি সেই ধারণার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।)

এভাবে ভাবলে একটা যুক্তি নিশ্চিত ভাবে প্রতীয়মান হয় যে ‘সাহিত্য’ নামক বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট যুগে, এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে জন্ম নিয়েছে। দেশভেদে সেই প্রেক্ষিতগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। দেশে দেশে সাহিত্যের ইতিহাসের ইতিহাস-রচনার (literary historiography) উদ্দেশ্য-বিধেয় ও তাদের মধ্যে বিভিন্নতা– এই বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকলে তাই ক্লাসরুমে সাহিত্যপাঠ নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আবার “সাহিত্য কখন?”– এই প্রশ্ন পরিবর্তিত হতে পারে “সাহিত্য কখন জন্ম নেয়?” – এই প্রশ্নে। লেখক যখন লেখেন তখন? না কি, পাঠক যখন পড়তে শুরু করেন, তখন? কোনো একটি বই যদি একজন পাঠকও না পড়ে থাকেন তাহলেও কি সেই বইকে ‘সাহিত্য’ বলা যাবে? এক ফরাসী তাত্ত্বিক তো সেই কবে, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি, ঘোষণা করে দিয়েছেন যে ‘টেক্সট্’ জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখকের মৃত্যু ঘটে যায়। আর এক ততোধিক জাঁদরেল ফরাসী পণ্ডিত আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যেবই লেখা শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু বইয়ের ‘প্রস্তাবনা’ (Foreword) লেখা হয়ে থাকে; যদিও তার স্থান হয় বইয়ের এক্কেবারে শুরুতে।

আচ্ছা, সাহিত্যের অস্তিত্ব আদৌ আছে কেন, এই প্রশ্ন যদি করা হয়, তাহলে? এই প্রশ্ন তবে প্রথমেই আমাদের নিয়ে যাবে সমাজে সাহিত্যের কী উপযোগিতা হতে পারে, সেই দিকে। সেক্ষেত্রে, সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয়; সাহিত্য আমাদের নীতি শিক্ষা দেয় – এমন সব উত্তর আসতে পারে। সাহিত্য কি একইসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারে? না কি একটা কাজ সফলভাবে করতে গেলে অন্য কাজটি ব্যাহত হয়? এর থেকে আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে সেইদিকে যেখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে কেন? কেনই বা মানুষ সাহিত্য পাঠ করে?

কেউ ভাবতে পারেন যে এমন কোনো দিন কি আসতে পারে যখন মানবজীবনে বা মানবসমাজে সাহিত্যের কোনো প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না? আবার, এ প্রশ্নও মনে জাগতে পারে, সাহিত্যিক যখন লিখতে শুরু করেন তখন কি এটা ধরে নিয়ে তিনি শুরু করেন যে তিনি 'সাহিত্য' সৃষ্টি করছেন?

প্রশ্ন করতে করতে আলোচনা এমন এক জায়গায় এসে ঠেকলো, যেখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে,এক বিশেষ সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা সমাজে 'সাহিত্য' নামক ধারণা ও বিষয়টির জন্ম দেয়। সমাজে মানুষের কিছু বিশেষ প্রয়োজন, মানবমনের কিছু বিশেষ ইচ্ছে বা মতাদর্শ কিছু নির্দিষ্ট প্রকারের সাহিত্য গ্রন্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে চরিতার্থতা লাভ করে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীর কাজ হচ্ছে সেই প্রয়োজনগুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করা। তাই ক্লাসরুমে সাহিত্যপাঠের এক আবশ্যিক দায়িত্ব হচ্ছে সেই মতাদর্শগুলির অনুসন্ধান করা। ভুলে গেলে চলবে না যে সাধারণভাবে অনেক চিন্তা-ভাবনাকেই 'সত্যি/সঠিক' ভেবে নিয়ে আমরা আমাদের জীবন প্রায়শই কাটিয়ে দিই সেইসব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কোনো বিশেষ মতাদর্শের কী প্রকারের যোগ আছে তা না ভেবেই। সাহিত্যের 'production', 'reception', 'ideology' – বিষয়ের ঝোঁক অনুযায়ী সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যপাঠের বিভিন্নতার কথা তাই প্রাসঙ্গিক ও অবশ্য-বিচার্য। সাহিত্যের ক্লাসে তাই 'প্রশ্ন করার এক মানসিকতা' সতত বজায় রাখা ছাত্র-ছাত্রীর এক অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত।

সময়াভাবের কারণেই আর একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের আলোচনা আজকে করা সম্ভব হলো না। সেটি হলো সাহিত্যের প্রকরণ-সম্বন্ধীয় – "সাহিত্য কিভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে?"("How of what of literature") ভারতীয় প্রেক্ষিত ভাবলে সে আলোচনা ধাবিত হতে পারে 'রস' কিংবা 'ধ্বনি' তত্ত্বের দিকে: আর পাশ্চাত্যের কথা ভাবলে আমাদের যেতে হতে পারে "স্টাইলিস্টিক্স", "ডিসকোর্স্ অ্যানালিসিস্" কিংবা "ন্যারেটোলজি'র কাছে। সে আলোচনা না হয় অন্য কোনো দিনের জন্যে তোলা রইলো।
উদ্যোক্তাদের অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করি।

নমস্কার!

মন্দির দর্শন

ড. শ্রীলা বসু
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু

বাংলার মন্দির আমাদের বহুদিনের নেশার বিষয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বাংলাদেশেও ঘুরেছি মন্দিরের সন্ধানে। খ্রিস্টিয় নবম শতকে যে মন্দির নির্মাণের সূত্রপাত, চৈতন্য আন্দোলনের পর সপ্তদশ শতক থেকে যার বিকাশ আর উনিশ শতক অবধি যার বিস্তার, বাংলার সেই সম্পদ আমাদের মুগ্ধ করেছে। শুধু তার শিল্প সৌন্দর্য নয়, মন্দিরের মধ্যে ইতিহাসের কতো যে উপাদান লুকিয়ে আছে তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু এসব মন্দির দেখা সাধারণত আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে ঠাঁই পায় না। বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে গবেষণামূলক লেখা লিখলেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এর রস থেকে থাকে বঞ্চিত। সে অভাব পূরণ করবার জন্যে কখনো কখনো কোনো কোনো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ডাক দেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলে ছবি দেখিয়ে আমারও জানাটা অন্যরকম চেহারা নেয়।

এবার দুর্গাপুর সরকারি কলেজ দিতে আহবান এল। বন্ধু অধ্যাপক মানস কুণ্ডুর ভাবনা। বেশ কিছু ছেলেমেয়ে প্রধানত তারা স্নাতক পঞ্চম সেমেস্টারের যথাসময়ে কেঁদুলির মন্দিরে হাজির। সঙ্গে বাংলার জয়ন্তীদি, ধনঞ্জয়। ইতিহাসের নন্দিনীও। তাঁরা আপ্যায়ন করলেন আমাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে। প্রথমে বাংলার মন্দিরের ইতিহাস আর চরিত্র নিয়ে কিছুটা কথা বলা। যে মন্দিরগুলি দেখা হবে সেদিন তার সংক্ষিপ্ত তথ্য হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া গেল।

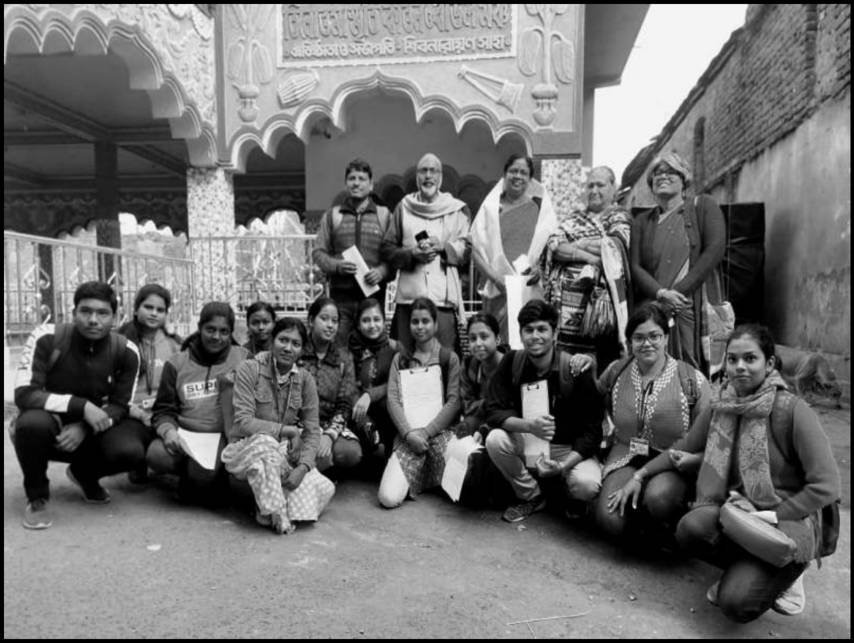

কেঁদুলি অজয় তীরের গঞ্জ। জয়দেবের কাহিনির পুণ্যে আর বর্ধমান রাজাদের তৈরি মন্দিরের গুণে তার মাহাত্ম্য। ছেলেমেয়েদের ছবি সহ বুঝিয়ে দেওয়া হয় বাংলার মন্দিরের বিভিন্ন শৈলী। সপ্তদশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ মন্দির দেখতে দেখতে ছাত্ররা বুঝে নেয় বাংলার মন্দিরের নানা প্রচলিত মোটিফ। দশাবতার থেকে সমাজ জীবন বা রামায়ণের কুম্ভকর্ণ হনুমান অনেকের ছবি। ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল মুখ আর নানবিধ প্রশ্ন ভালো লাগে।

এরপর বীরভূমের প্রাচীন গ্রাম ঘুড়িষা। সেখানে বীরভূমের প্রাচীনতম সপ্তদশ শতকের রঘুনাথ মন্দির ও উনিশ শতকের গোপাল মন্দির দেখা হয় একে একে। চারচালা রঘুনাথ মন্দিরের দুটি দিক কারুকাজে ঢাকা। মূল বিগ্রহ বর্গি আক্রমণের সময় লুট হয়। এখন এ মন্দিরে শিবের ভজনা হয়। মন্দিরে কৃষ্ণলীলার নানা আখ্যান। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা, কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, নবনারীকুঞ্জর ইত্যাদি মোটিফ এতোখানি এর আগে বাংলার আর কোনো মন্দিরে চোখে পড়ে না। উনিশ শতকের মন্দিরটি নবরত্ন। গালার ব্যবসায়ী ক্ষেত্রমোহন দত্ত এ মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ত্রিমাত্রিক শৈলী। সপ্তদশ অষ্টাদশের মন্দিরে যে দ্বিমাত্রিকতা রয়েছে উনিশ শতকের শৈলী তার থেকে আলাদা। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা বুঝতে পারে দুইয়ের তফাৎ। এ মন্দিরে সমাজচিত্রের পাশাপাশি রয়েছে দশমহাবিদ্যা বা কমলে কামিনীর ফলক। বিশেষত বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমলে কামিনীর এই ব্যতিক্রমী ফলকটি।

দিনের শেষে ঘোরা হয় ইলামবাজারের তিনটি মন্দির। নীল ও গালার বাণিজ্যের জন্যে ধনশালী হয়েছিল এ গ্রাম। বামুনপাড়ার লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির ও রামেশ্বর শিব মন্দির দ্রষ্টব্য। দুটি মন্দিরে রেড় অক্সাইডের প্রলেপ মূল

ফলকগুলির ক্ষতি করেছে। ইলামবাজার হাটতলার আটকোণা গৌর নিতাই মন্দির সেদিনের শেষ দ্রষ্টব্য। মন্দিরটি ছাদ বহু আগে নষ্ট হয়েছে। এ মন্দিরটিতে নোনা ধরেছে নিচের অংশে। উপরের ফলকগুলির অবস্থাও ভালো নয়। এখানে দেবদেবী থেকে উনিশ শতকীয় সমাজদৃশ্য সবই আছে। রয়েছে ঔপনিবেশিক প্রভাবও। তবে মন্দিরটি করুণ রক্ষণাবেক্ষণ ছাত্রছাত্রীদেরও চিন্তায় ফেলে।

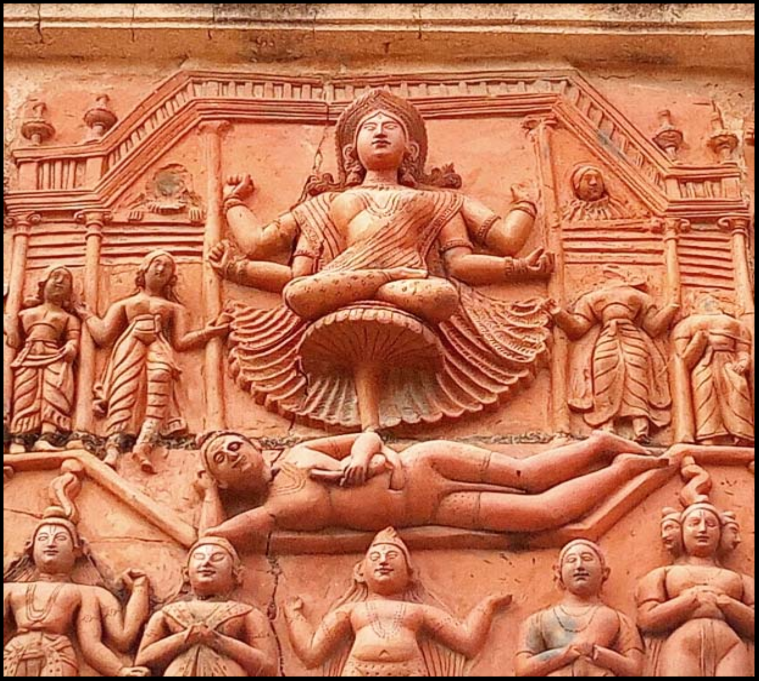

বাংলার মন্দিরের তার শিল্প ও ইতিহাসের মূল্যে অসাধারণ। কিন্তু তার সংরক্ষণের অবস্থা অনেকসময়ই চিন্তার। পারিবারিক উদ্যোগে সংরক্ষণ করতে গিয়ে অনেকসময় মন্দিরগুলির ক্ষতি হয় বেশি। তাই প্রয়োজন মন্দির শিল্প বিষয়ে সচেতনতার। উত্তর প্রজন্মের মধ্যে বাংলার এই শিল্প বিষয়ে সচেতনতার বড়ো প্রয়োজন। এ নিয়ে দুর্গাপুর কলেজের অধ্যাপকেরা যে ভেবেছেন , উদ্যোগী হয়ে ছাত্রদের ক্ষেত্রসমীক্ষায় নিয়ে এসেছেন এ জন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

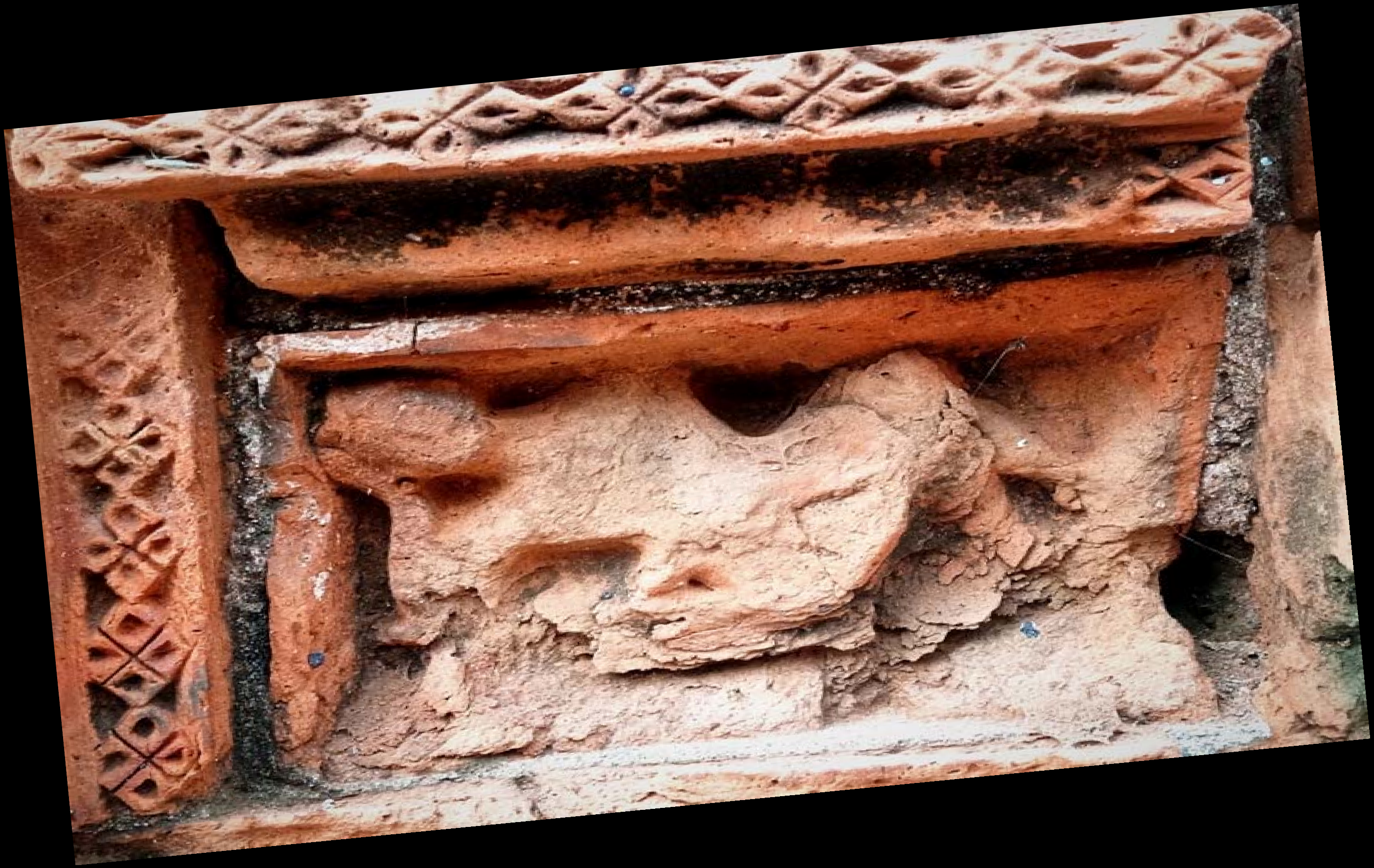

বাংলা বিভাগের
দেওয়াল পত্রিকা
“লেখন” ।

প্রথম সংখ্যার
সম্পাদক দুর্লভ
ঠাকুর, বাংলা বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার।

প্রস্তুতিপর্ব

পত্রিকা উদ্বোধন করছেন ড. দেবনাথ পালিত, অধ্যক্ষ, দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং অধ্যাপক অভীক মজুমদার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখন

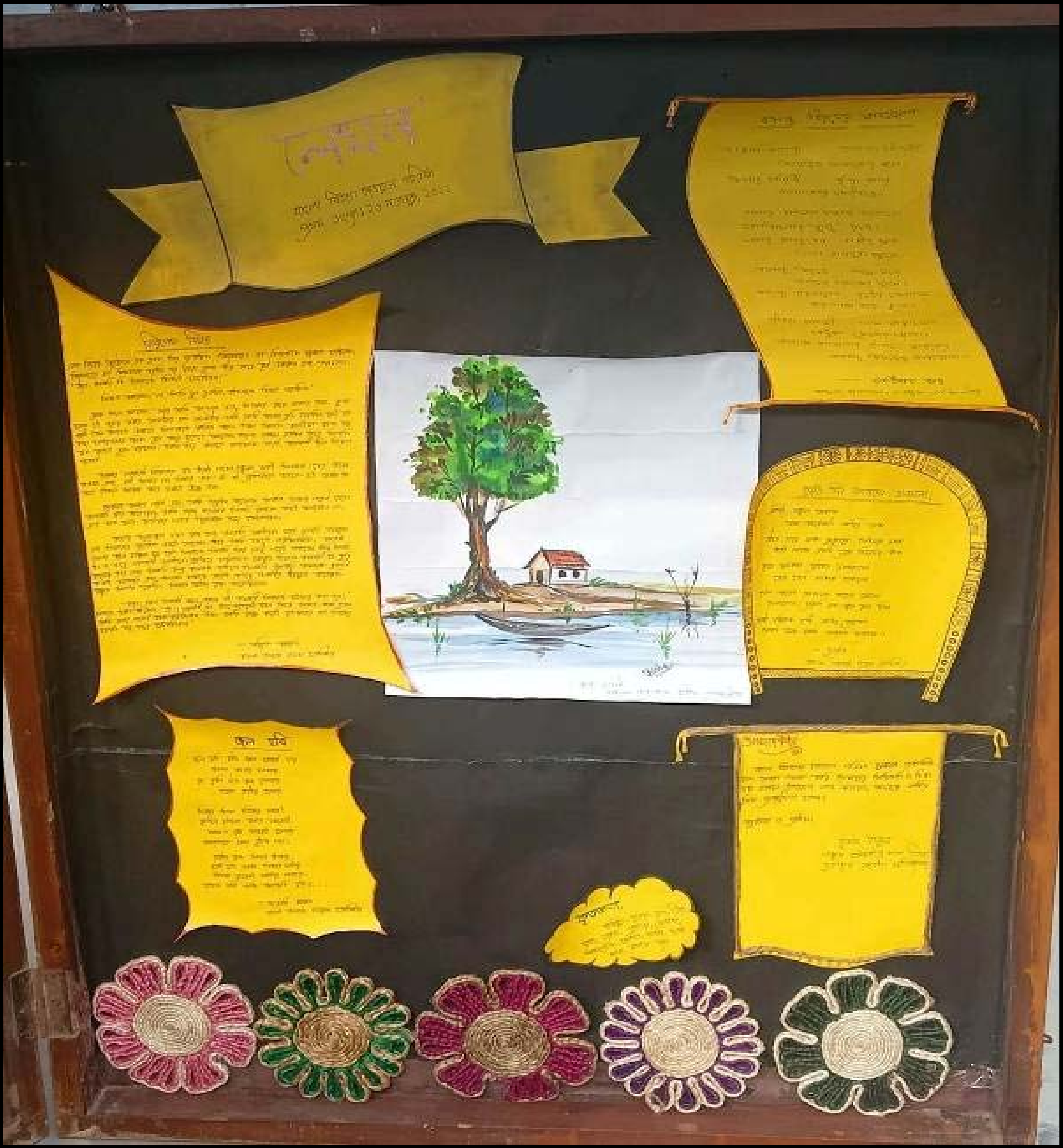

তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে

ছাত্রছাত্রীদের সেমিনার। বিষয়: "বাংলা ছোটগল্প" ও "মন্দির দেখা ও পড়া"

ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে অধ্যক্ষ ড. দেবনাথ পালিত

LOS ANGELES
STATE

স্পোর্টসে বাংলা বিভাগ

নির্বাচিত ছবি:

দুর্লভ ঠাকুর,
পঞ্চম সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

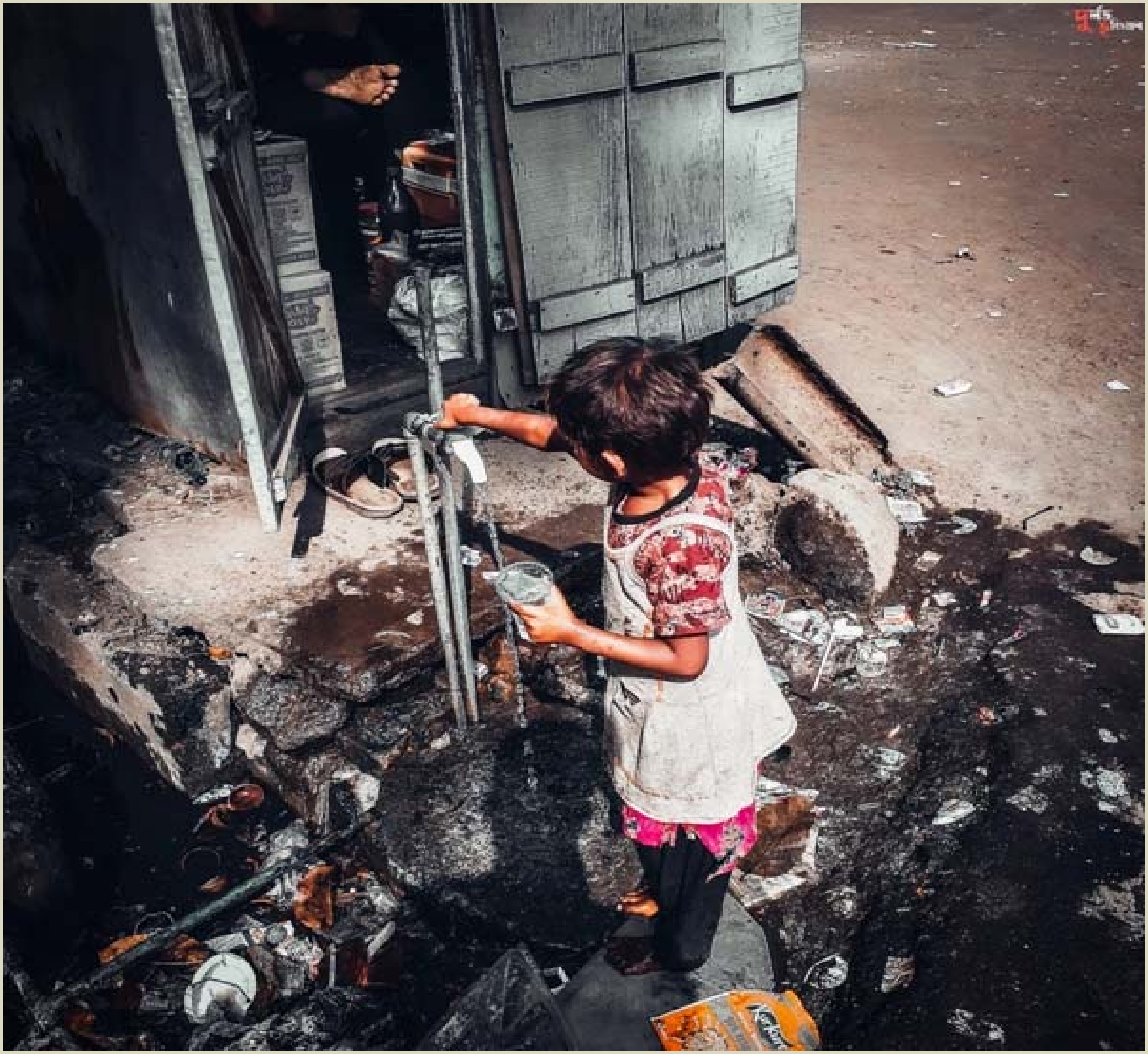

আগামী সংখ্যায়

ভাষা বিষয়ক কর্মশালা

আলোচনা সভার বিষয়:

সাহিত্যের ইতিহাস
রবীন্দ্রনাথ